কৃষি পর্যটন

সম্ভাবনাময় ৭টি খাত

Kwli †`k evsjv‡`k| HwZn¨-ms¯‹wZ mewKQ‡ZB Kwl Rov‡bv| mvwi mvwi Avg evMvb, b`xi i‚cvjx Bwjk, bv›`wbK wPswoi †Ni, bev‡bi Drme, meR Pv-evMvb, ˆbmwMK Kgjv-Avbvim evMvb| meB Kwl chU‡bi PgrKvi me m¤¢vebv| Gme wb‡q wj‡L‡Qb

আসাদুর রহমান । পারভীন তানী

অতি ব্যবহার ও পরিবেশ `l‡Yi কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পর্যটন স্পটগুলোও আকর্ষণ হারা‡"Q। গাছ কাটার কারণে বন-জঙ্গল কমে যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে কৃত্রিম সাফারি পার্ক। সমুদ্র পরিণত n‡"Q আবর্জনার স্তুপে, সৈকত পর্যটক হারাচ্ছে। পাহাড় কাটার কারণে প্রকৃতি হারাচ্ছে ভারসাম্য।

এ অবস্থায় পর্যটনকে আকর্ষণীয় করতে বেছে নেয়া n‡"Q কৃষিকে। কৃষি পর্যটন নামে এই উদ্যোগ কৃষির অভিজ্ঞতার সঙ্গে পর্যটকদের পরিচয় করানোই এর উদ্দেশ্য। যেমন, একটি জলপাই বাগানকে পর্যটন স্পট হিসেবে পরিচয় করানো হয় তখন, যখন জলপাই গাছ থেকে জলপাই সংগ্রহ করা, সেটাকে বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কাছ থেকে দেখার সুযোগ থাকে পর্যটকদের। স্পেনের অনেক মাঠে জলপাইকে কেন্দ্র করে উৎসব হয়। এ ক্ষেত্রে পর্যটকদের থাকার জায়গাটি কোনো বিলাসবহুল হোটেলে হয় না। তারা থাকেন স্থানীয় বাড়িঘরে। এখানে পর্যটনের অংশ কৃষিপণ্য শুধু নয়, কৃষকের ঘর ও তাঁর জীবনযাত্রাও পর্যটনের অংশ। এটা একটা দেশের গ্রাম সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশেও পর্যটনে নতুনমাত্রা যোগ করতে পারে এই কৃষি পর্যটন।

আমবাগান : ট্যুরিস্টদের আকর্ষণীয় স্থান

ইকুয়েডর। দক্ষিণ আমেরিকার এ দেশটি বর্তমানে কৃষি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান। ইকুয়েডরের অবস্থান আমাজান অঞ্চলে। সে কারণেই এখানকার আবহাওয়া কৃষির জন্য যথেষ্ট উপযোগী। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। কলা, পেঁপে, ভুট্টার সঙ্গে

সঙ্গে স্থানীয় ফল উৎপাদন হয় প্রচুর। এসব ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করা, বাজারে বিক্রি করা পর্যন্ত সবই প্রত্যক্ষ করতে পারে পর্যটকরা। পর্যটকরা পরিচিত হয় ইকুয়েডরের নিজস্ব ফল 'নারানজিলা' এবং 'আরজার' সঙ্গে। সেই সঙ্গে উপভোগ করতে পারে গবাদিপশুর খামার ও শস্যক্ষেত। এ সম্পদ নিয়েই ইকুয়েডর গড়ে তুলেছে তার কৃষি পর্যটন।

বাংলাদেশও অনুসরণ করতে পারে ইকুয়েডরের পথ। এক্ষেত্রে দেশের বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের আম বাগানগুলোকে কাজে লাগানো যেতে পারে। বাংলা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকা শুরু হয়। পাওয়া যায় জুলাই মাস পর্যন্ত। আমের মধ্যে আছে ভিন্নতা। এই মাসগুলোর বিভিন্ন সময় একের পর এক আম পাকা শুরু হয়। 'খিরসাপাত' আমটি পাকে মে মাসের শেষে। 'গোপালভোগ' পাকে খিরসাপাত শেষ হওয়ার পর। এর পরপরই আসে ল্যাংড়া। তারপর ফজলি। ফলে এই ক'টা মাসের প্রত্যেকটি মাসই বাগানে আম থাকে।

আমের জন্য বিখ্যাত বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকা। এ অঞ্চলে অন্য কিছু উৎপাদন হয় না। যেদিকেই তাকানো যায়, শুধু আমবাগান। সম্পূর্ণ জেলাটি জুড়ে আমবাগান। ফলে মানুষের অর্থনৈতিক নির্ভরতা শুধু আমে। আম যখন পাকে তখন বাগান, রাস্তাঘাট আমের মো মো গন্ধে ভরে ওঠে। আম পাড়া নিয়ে শুরু হয় তোড়জোড়। ট্রাক এসে দখল করে রাস্তাঘাট। আম পেড়ে ট্রাকে তোলা হয়। ট্রাকে করে আম আসে ঢাকায়। দু'তিন মাস ধরে দেখা যায় একই দৃশ্য। এ ক'মাসের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ পরিচিতি পেতে পারে আমভিত্তিক ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে। পর্যটকদের বিভিন্ন বাগানে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আমের সঙ্গে ঐ অঞ্চলের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়াই হতে পারে আমভিত্তিক ট্যুরিজমের মুখ্য কাজ। সেই সঙ্গে গড়ে তোলা

PvcvBbeveM‡Äi AwaKvsk GjvKv R‡o i‡q‡Q bvbv Rv‡Zi Avg evMvb

যায় আম প্রক্রিয়াকরণ শিল্প যেখানে তৈরি হবে আমের আচার, সিরাপ, জুস ইত্যাদি। তাজা আমের স্বাদ পাবে পর্যটকরা এখানে। পর্যটকের থাকার জন্য তৈরি হতে পারে সাধারণ মাটির ঘরবাড়ি। যদিও ভেতরে থাকবে আধুনিক ব্যবস্থা। দেশী-বিদেশী পর্যটকদের পর্যটনের নতুন স্বাদ দেবে এই মাটির ঘর। শুধু তাই নয়, আমকেন্দ্রিক কৃষি পর্যটনকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য ব্যবস্থা থাকবে উপযুক্ত যানবাহনের, যা পর্যটককে আশপাশের অঞ্চলগুলো ঘুরে দেখাবে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে কাছেই রাজশাহী শহর। শহরটিরও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে, যেন পর্যটক আকর্ষণ করে। পদ্মা নদীতে ঘুরে বেড়ানো, মাছ ধরার ব্যবস্থাও হতে পারে। একই সঙ্গে ঘুরে আসা যায় আশেপাশের বিভিন্ন স্থান যেমন বগুড়ার মহাস্থানগড়, নাটোরের রাজবাড়ী প্রভৃতি। পর্যটক যখন ফিরে যাবে তখন সঙ্গে নিয়ে যাবে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা।

পর্যটনের উপকরণ: ইলিশ মাছ

মাছের রাজা ইলিশকে তার নিজস্ব সৌন্দর্য আর স্বাদের জন্য দেশী-বিদেশী সবার কাছে প্রিয়। ইলিশ ধরা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, জেলেজীবন আর সর্বোপরি ইলিশের স্বাদ গ্রহণ বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে এ দেশে গড়ে উঠতে পারে ইলিশভিত্তিক পর্যটন।

দেশের চাঁদপুর জেলায় মেঘনা নদীর যে অংশটুকু পড়েছে সেখানে সবচেয়ে বেশি ইলিশ ধরা পড়ে। তাই এ ধরনের পর্যটন শিল্প গড়ে তোলার জন্য চাঁদপুরকে বেছে নেয়া যেতে পারে। বছরের জুন থেকে আগস্ট এই সময়টুকুতেই চাঁদপুরের মেঘনায় প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ে। তাই এ তিনটি মাস এ ধরনের পর্যটনের জন্য উৎকৃষ্ট সময়।

চাঁদপুরের হাইমচরের জেলেরা ইলিশ ধরতে নৌকা বা ট্রলার ব্যবহার করে। এই ট্রলারে পর্যটকদের জন্য আধুনিক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিশাল আকৃতির এই ট্রলারগুলো মাছ ধরতে ৫-৭ দিনের জন্য বেরিয়ে পড়ে। মাছ ধরতে ধরতে তারা নদী ছাড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চলে যায়। ট্রলারগুলোতে রয়েছে মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা। এই ক'দিন তারা যে মাছ ধরে তা বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করে। বেশি মাছ পেলে তারা সামনের আড়তে বিক্রি করে দেয়। এই ট্রলারে পর্যটকদের পরিবহনের ব্যবস্থা করা হলে তারা খুব কাছে থেকে জেলে জীবন উপভোগ করতে পারবে। তাদের জন্য ইলিশের তৈরি বিভিন্ন উপাদেয় খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ইলিশ মাছ উপভোগের পাশাপাশি পর্যটকদের নদীপাড়ের বাঙালি জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে।

মৌসুম শেষে জেলেরা যখন শেষবার মাছ ধরে ফিরে আসে তখন তারা বিভিন্ন রঙের পতাকা দিয়ে ট্রলার সাজিয়ে নেয়। ট্রলারের ভেতর চলে পালাগান। ঘাটে ফিরে জেলেরা পরবর্তী বছরের জন্য জাল সংরক্ষণ করে রাখে। এ সময় তারা জাল সংরক্ষণে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়। জেলেজীবনে বয়ে চলে এক আনন্দঘন পরিবেশ। রাত জেগে তারা জালে গাব দেয়। রাতে কাজের পাশাপাশি চলে গানের আয়োজন। জেলেজীবনের এই অংশটুকুও পর্যটকদের আগ্রহী করে তুলবে। mv¤cwZKKv‡j evsjv‡`k chUb K‡cv‡ikb Le mxwgZ AvKv‡i kxZKv‡j Pv`c‡i Bwj‡ki bxo cwi`k‡bi Av‡qvRb K‡i

Pv`c‡ii b`x¸‡jv‡Z †`Lv hvq Bwjk aivi `k¨

Avm‡Q| wKš GB †bŠ-âgY Av‡iv A‡bK we¯Z Ki‡Z n‡e|

অবশ্য এ কাজে প্রয়োজন ইলিশ সংরক্ষণ। অবৈধভাবে যেন জাটকা ইলিশ না ধরা হয় সেদিকে সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে। নৌপথকে করে তুলতে হবে নিরাপদ।

সিলেট মৌলভীবাজারের কমলাভিত্তিক পর্যটন

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া থানা থেকে ৩০ কিলোমিটার পথ পেরুলেই জুরি ইউনিয়ন। ইউনিয়নটি কমলা চাষে দিন দিন বিখ্যাত হয়ে উঠছে। এখানে বিভিন্ন গ্রামে রয়েছে কমলার বাগান। ছোট ছোট টিলায় ঘেরা এ ইউনিয়নের স্থানীয়রা তাদের জমিতে কমলা চাষ করছে। সুমিষ্ট আর মানসম্পন্ন কমলা উৎপন্ন হওয়ায় এখানকার চাষীরা অন্য ফসল করার বদলে কমলা চাষে বেশি আগ্রহী। বর্তমানে এখানকার ধান চাষিরা কমলা চাষী হিসেবে পরিচিত। বাগানের গাছগুলোর কোনো কোনোটিতে ২ হাজারেরও বেশি কমলা উৎপন্ন হয়। গুণগত মানে ভালো হওয়ায় এ কমলার চাহিদাও বেশি।

শুধু জুরি নয়, মৌলভীবাজার জেলার অন্যান্য থানা এবং সিলেটে বিয়ানীবাজারসহ বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের কমলা উৎপন্ন হয়। নবেম্বর মাসের শেষের দিকে কমলা পাকতে শুরু করে। তবে কোথাও কোথাও অক্টোবর থেকেই কমলা সংগ্রহ করা যায়। অক্টোবর থেকে জানুয়ারি- মূলত এই চার মাস এখানকার বাগানগুলোতে কমলা পাওয়া যায়। আর এ কমলা বাগানগুলোকে ঘিরেই গড়ে উঠতে পারে পর্যটন।

কুলাউড়া থানা হতে পারে কৃষিভিত্তিক একটি উৎকৃষ্ট পর্যটন কেন্দ্র। বিশেষ করে নবেম্বরে যখন কমলাগুলো পাকতে শুরু করে তখন তা খুবই নয়নাভিরাম ও মনোমুগ্ধকর। ছোট ছোট টিলা, তার ওপর সারি সারি কমলা বাগান খুবই আকর্ষণীয়। হলুদ রঙে পেকে থাকা কমলাগুলোর বাগান ঘুরে বেড়ানোর জন্য অসাধারণ। এ বাগানগুলো পর্যটকদের অবশ্যই দৃষ্টি কাড়বে।

বাগানগুলো ঘিরে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন করা সম্ভব। এখানকার স্থানীয়রা অনেকেই টিলার ওপর বাড়িঘর বানিয়েছে। স্থানীয়দের আদলে পর্যটকদের জন্য এখানে বাড়িঘর তৈরি করা যেতে পারে। তাছাড়া সিলেটের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত খাবার, পোশাক, নাচ, গান প্রভৃতি পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে হবে।

বাগানগুলোর পাশাপাশি এখানে কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়। যেমন- কমলার জুস বা জেলির ইন্ডাস্ট্রি। বাগানে বেড়ানোর পাশাপাশি পর্যটক শ্রমিক কারখানায় কমলা প্রক্রিয়াজাত দেখার সুযোগ পাবে। কৃষিভিত্তিক পর্যটনে পৃথিবীব্যাপী এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। একইভাবে সিলেট, মৌলভীবাজারের আনারস বাগানগুলোকেও এ ধরনের কৃষি পর্যটনের আওতায় নিয়ে আসা যায়। এ এলাকায় উৎপাদিত হয় বিখ্যাত 'জলডুবি' আনারস। এই আনারসের মধুর স্বাদের পরিচিতি রয়েছে দেশে-বিদেশে।

সিলেট নয়, আনারসকে কেন্দ্র করে দেশের পার্বত্য ৩ জেলায় গড়ে উঠতে পারে কৃষি পর্যটন। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানে প্রচুর পরিমাণে আনারস উৎপাদিত হয়। সেখানকার কৃষকরা পরিবহনের অসুবিধার জন্য আনারস বিক্রি করে উপযুক্ত মূল্য পায় না। জেলা তিনটিতে রয়েছে নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পাশাপাশি এখানের আনারসভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। এতে পর্যটক নৈসর্গিক সৌন্দর্য দর্শনের পাশাপাশি আনারসের বাগান বেড়ানো, আনারসের প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় ঘোরার সুযোগ যাবে, অন্যদিকে আনারস চাষী পাবে তার পণ্যের উপযুক্ত মূল্য।

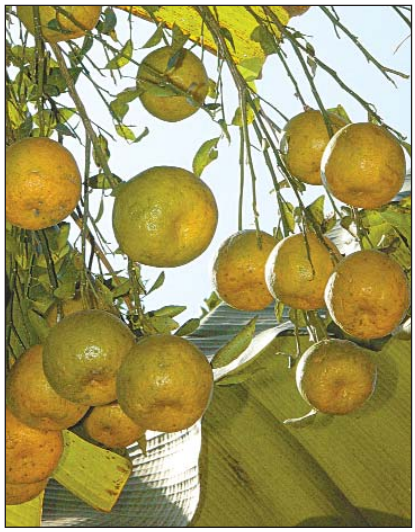

wm‡j‡Ui bqbwfivg Kgjv evMvb

মৌলভীবাজারে রয়েছে লাউয়াছড়া। এটি দেশের একমাত্র রেইন ফরেস্ট। কমলা বাগানে বেড়ানোর পাশাপাশি পর্যটকরা এ রেইন ফরেস্টটিতেও বেড়িয়ে আসতে পারেন। এ বনে গিয়ে বেশ কিছু দুর্লভ বন্যপ্রাণী বিশেষত বিরল প্রজাতির উল্লুক দেখা যাবে। তাছাড়া কুলাউড়া থেকে বেড়িয়ে আসা যায় হাকালুকি হাওর। বিশাল আয়তনের এই হাওরে শীত মৌসুমে আগমন ঘটে দেশ-বিদেশের নানা ধরনের পাখির। জুরি ইউনিয়ন থেকে ৩-৪ কিলোমিটার এগোলেই মাধবকুন্ড জলপ্রপাত। দেশের বৃহৎ এ জলপ্রপাতটি খুবই আকর্ষণীয়।

সিলেট, মৌলভীবাজারে কমলাভিত্তিক পর্যটন উন্নয়নের জন্য এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন স্থানীয়দের কমলা চাষে উদ্বুদ্ধ করা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কমলা ও আনারস চাষ প্রকল্প থেকে এখন সেখানকার চাষিরা

কৃষি পর্যটনে থাইল্যান্ড

ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে থাইল্যান্ডকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই। প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ট্যুরিস্ট আসে থাইল্যান্ডে। এই আকর্ষণ আরো বাড়ানোর জন্য সে দেশের সরকার উদ্যোগ নেয় কৃষি পর্যটনের।

থাইল্যান্ডের একটি ইতিবাচক দিক হলো প্রকৃতি অকৃপণভাবে থাইল্যান্ডকে দিয়েছে সমুদ্র, সৈকত, পাহাড়, নদী। সেই সঙ্গে দিয়েছে উর্বর মাটি। এখন থাইল্যান্ড তার এই উর্বর মাটিকে কাজে লাগাচ্ছে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য। এ লক্ষ্যে ২০০০ সালে দেশটির পর্যটন কর্তৃপক্ষ কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য ১২৫ মিলিয়ন বাথ বিনিয়োগ করে। এখানে সরকারও যুক্ত হয় পর্যটন শিল্পকে আরো উন্নয়ন করতে। দু'বছর পর প্রকল্পটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পায় সমুদ্র, নদী ও পাহাড়ের পাশাপাশি। এখানে পর্যটকদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় থাইল্যান্ডের কৃষিপণ্য যেমন- জেসমিন রাইস, ফল ও ফুলের সঙ্গে একেবারে মাঠ পর্যায়ে। থাইল্যান্ডের প্রতি কৃষিক্ষেত্রে পর্যটকদের দেখানো হয় পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বিক্রি করা পর্যন্ত। এখানে কৃষক মুখ্য ভূমিকায় থাকে বলে পর্যটক কৃষককে একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায়। শুধু তাই নয়, পর্যটককে এখানে থাকতে হয় কৃষকের বাড়িতে। ট্যুরিস্টদের থাকা, যাতায়াত ও বিনোদনের সব ব্যবস্থাই দেশটির সরকার করে। যেমন- থাইল্যান্ডের 'সামুত সংখ্যারাম' স্থানটির কথা উল্লেখ করা যায়। জায়গাটি গাড়ি দিয়ে ব্যাংকক থেকে মাত্র ১ ঘন্টার পথ। গাড়ি ছাড়াও বাস-ট্রেনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সেখানে। জায়গাটি বিখ্যাত ফল ও ফুলের বাগানের জন্য। গ্রামটির পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে, যেখানে পর্যটকরা একই সঙ্গে নৌকা চালিয়ে বাগানের ভেতর ঘুরতে পারে। নারিকেল ও পমেলো নামে এক ধরনের বাতাবিলেবুর ওপর নির্ভর এখানকার ৮০ ভাগ কৃষক। কিভাবে নারিকেলের চিনি তৈরি করা হয় তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপভোগ করতে পারবে পর্যটক। কৃষি পর্যটনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ঐতিহাসিক স্থান, দুর্গ, স্মৃতিস্তম্ভ উপভোগ করা যায়, যা গ্রামটির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। এছাড়াও থাইল্যান্ড মাছের খামারকে কেন্দ্র করে ট্যুরিজম গড়ে তুলেছে। এখানে দেখতে পারে জানতে পারে মাছ ধরা থেকে কাটা, প্যাকেট করা পর্যন্ত। পর্যটন শুধু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেই ভূমিকা রাখে না, দেশ-বিদেশের কাছে তুলে ধরে নিজস্ব ঐতিহ্য, সামাজিক বন্ধন আর জীবন যাপনের ধরন। থাইল্যান্ডের কৃষি পর্যটনের লক্ষ্য সেটি। এ প্রক্রিয়াটিকে আরো গতিশীল করতে থাই সরকার করছে নানামুখী সহযোগিতা।

চারা সংগ্রহ করছে, দেয়া হচ্ছে চাষের বিভিন্ন পরামর্শ। এতে চাষিরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে কমলা চাষে। তবে এ কাজটি আরো ব্যাপকভাবে করতে হবে। পাশাপাশি লাউয়াছড়া রেইন ফরেস্টটি যেন কোনোভাবে নষ্ট না হয়ে যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। সংরক্ষণ করতে হবে হাকালুকি হাওরের জীববৈচিত্র্যকে। এতে কমলা বাগানে বেড়াতে এসে পর্যটক ঘুরে বেড়ানোর আরো কিছু দর্শনীয় স্থান পাবে।

ফলভিত্তিক পর্যটন শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো হাঙ্গেরি। তারা কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম ফল উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়। হাঙ্গেরি এই ফল উৎপাদনকে কেন্দ্র করে এগ্রো ট্যুরিজম গড়ে তুলেছে। খুব দক্ষতা, আর বিচক্ষণতার মধ্য দিয়ে তারা এ কাজ শুরু করে। হাঙ্গেরিতে উৎপাদিত ফল যেমন ; আপেল, খুবানি বিভিন্ন বেরী জাতীয় ফল, চেরির বাগানগুলোকে অল্প সময়ের মধ্যে পর্যটন স্পটে রূপ দিয়েছে। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে তারা তাদের মাঠ, বন, জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংস করছে না বরং ফলের বাগানে বেড়ানোর পাশাপাশি তারা যেন সে অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, সে ব্যবস্থা করে রেখেছে।

হাঙ্গেরির এ ফল বাগানে ঘুরতে এসে ট্যুরিস্ট গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। আর রাত কাটাবার ঘরটিও থাকে গ্রামীণ কাঠামোয় তৈরি। ফল পাকার পর ফল সংগ্রহের সময় শুরু হয় উৎসব। ফল সংগ্রহ, কারখানায় নেয়া, প্রক্রিয়াজাত সবই প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটে একজন পর্যটকের। পর্যটকরা যেন সহজেই আসতে পারে সে জন্য বাগানে তৈরি করা হয়েছে রাস্তা। ব্যবস্থা করা হয়েছে সহজ যানবাহনের। এই বাগানগুলোর অধিকাংশই ব্যক্তিমালিকানাধীন। তবে সরকারও দেশটিতে ফলভিত্তিক পর্যটন শিল্প গড়ে তোলার জন্য নিয়েছে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা।

নবান্ন উৎসব : পরিচয় ঘটবে গ্রাম বাংলার সাথে

এ দেশের কৃষক এখন বছরে ৩টি ধান চাষ করতে পারে। তাই সারা বছর এ দেশে চলে ধান লাগানো আর কাটার উৎসব। কিন্তু নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে আমন ধান কাটা ও সংগ্রহ করাতে গ্রামবাংলায় এখনও পাওয়া যায় এক ভিন্ন আমেজ। ঘরে নতুন ধান ওঠা, খেজুরের রস আর শীত মৌসুম- এসব কিছু মিলে গ্রামে তখন একটি উৎসবমুখর পরিস্থিতি বিরাজ করে। আমন ধান কাটার সময় কোনো একক পরিবার নয়, সম্পূর্ণ গ্রামটিই মেতে ওঠে উৎসবে। কৃষকের বাড়ির উঠানে ধান মাড়াইয়ের কাজ চলে। মেশিনের সাহায্যে ধান আর খড় খুব দ্রুত আলাদা করা হয়। অন্যদিকে গৃহবধূরা ব্যস্ত থাকে ধান সেদ্ধ

Mvg evsjvi avb msM‡ni wPivqZ `k¨

করতে। সেই সেদ্ধ ধান শুকিয়ে কলে অথবা ঢেঁকিতে ভাঙে। গৃহবধূদের পা ঢেঁকির সঙ্গে ওঠানামা করে আর অন্য মহিলারা সেই ছন্দে গান ধরে।

নতুন ধানের চালে পিঠা উৎসব শুরু হয় ভোর থেকে। ভাঁপা, পাটিশাপটা, চিতই, পুলি, কাটা, রসভরি পিঠা তৈরি হয়। গরম পিঠার গন্ধে চারদিক মৌ মৌ করে। মাটির চুলায় তৈরি পিঠার স্বাদই আলাদা। সাধারণ কিছু পিঠার সঙ্গে সেই এলাকার নিজস্ব কিছু পিঠা থাকে। পিঠা নিয়ে চলে কাড়াকাড়ি।

বাড়ির গৃহকর্তা ব্যস্ত ধান ওঠানোতে, গৃহবধূ ব্যস্ত ধান সেদ্ধতে। বাড়ির ছেলেমেয়েদের স্কুল বন্ধ থাকায় তারা মেতে থাকে বিভিন্ন ধরনের খেলায়। নবান্ন উৎসবের পাশাপাশি বাড়ির মজা পুকুরগুলোতে চলে মাছ ধরা। বর্ষার পানিতে বাড়ির পাশের ডোবায় যেসব মাছ এসে জড়ো হয়, বছরের এ সময়টিতে এসে তা হয়ে ওঠে খাওয়ার উপযোগী।

এ সময় গ্রামের সম্পূর্ণ চিত্রই বদলে যায়। নীরব গ্রাম হয়ে ওঠে সরব। ধান কেটে সারি বেঁধে বাড়ি ফেরে কৃষক। পেছনে পেছনে ছোটাছুটি করে গ্রামের ছেলেমেয়েরা। অপেক্ষা করে ধান চাল হবার। এই ধান শেষ হলে কৃষক আবার প্রস্তুতি নেয় নতুন বীজতলার। নবান্নের এই মৌসুমকে কেন্দ্র করে বাংলার গ্রামগুলোতে গড়ে তোলা যায় কৃষিভিত্তিক পর্যটন। বাংলাদেশের নবান্ন উৎসব তা দেশের অনেক মানুষের কাছেও অজানা। এমনকি শহুরে বাংলাদেশীদের কাছেও। ছুটির কয়েক দিন এসে এখানে কাটিয়ে যাবে পর্যটক। স্বাদ নিয়ে যাবে কৃষক জীবনের। একটু গুছিয়ে নিলে খুব সহজেই এখানে গড়ে তোলা যায় কৃষি পর্যটন। পর্যটক এসে থাকবে কৃষকের বাড়িতে। এ ক্ষেত্রে বাঁশ ও ছন দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে কিছু কটেজ। যেগুলো গ্রাম্য কুটিরের প্রতিনিধিত্ব করবে। একই সঙ্গে শহুরে পর্যটকদের জন্য থাকবে আরামদায়ক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা। বাড়ির ছোট পুকুরগুলোতে মাছ ধরার প্রতিযোগিতার আয়োজন হতে পারে।

এ ধরনের পর্যটনে পর্যটক যেমন নবান্ন উৎসবকে একেবারে সামনে থেকে দেখতে পারবে, তেমনি কৃষকেরও একটি বাড়তি উপার্জনের পথ সৃষ্টি হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ইউরোপীয় দেশ গ্রীসের কথা। দেশটির গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই কৃষি পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল। তারা তাদের পর্যটনে নতুনত্ব আনার জন্য গ্রামে তৈরি করেছে সনাতন নকশায় আধুনিক কটেজ। যেখান থেকে সে সহজেই গ্রিক বাগান, ক্ষেত বেড়াতে পারে।

সুইডেনের কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। যদিও সুইডেন কৃষি ট্যুরিজমকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে। এখানে কৃষি ট্যুরিজমকে বলা হয় 'ফার্ম ট্যুরিজম'। এখানে একটি কৃষি খামার বা ফার্মের মধ্য দিয়ে বেড়ানোর মাধ্যমে সেই ফার্মটা সম্পর্কে জানতে পারে পর্যটক। ফার্মে সে ঘুরতে পারে হেঁটে, গাড়ি বা সাইকেল দিয়ে পর্যটকের থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে সেখান। একটি ফার্ম হাউজে পর্যটক থাকবে। সে অঞ্চলের খাবার খাবে এবং ফসল তোলার উৎসবে অংশগ্রহণ করবে। এমনকি পর্যটক কৃষকের সঙ্গে বাজারে গিয়ে ফসল বিক্রি উপভোগ করতে পারবে। সুইডেনের মূল উদ্দেশ্য হলো সম্পূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে ছুটি কাটানোই শুধু নয় বরং পরিবেশ সম্পর্কে জানা, তার স্বাদ নেয়া। একটা অঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে যেন পর্যটক তার নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে। একই সঙ্গে পরিবেশ সম্পর্কেও সচেতন হবে। দেশটির অর্থনীতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

বৈচিত্র্যময় চা বাগান

মৌলভীবাজার, কুলাউড়া, শ্রীমঙ্গল ও পঞ্চগড়ে বৃষ্টি ধোয়া পানিতে চিক্‌চিক্ করে ওঠে চা

পাতার নতুন কুঁড়ি। টিলার পর টিলা ভরে ওঠে নতুন পাতায়। শুরু হয় কুলিদের চা পাতা তোলা। সময়টা সাধারণত হয়ে থাকে মার্চ মাস। তবে চা তোলার আসল সময় জুন, জুলাই ও আগস্ট। এ সময় প্রতিটি বাগান মালিক ও কুলিদের আগমনে সরব হয়ে ওঠে। দ্রুত কুলিদের হাত চলতে থাকে। পিঠে বাঁধা ঝুড়ি ভরে যায় চা পাতায়। সেই চা পাতা প্রক্রিয়াজাত করার জন্য প্রথমে আধা শুকানো হয়। আধা ভেজা পাতা কেটে আলাদা করে ফার্মি করে। পরবর্তীতে মেশিনে পুরোপুরি শুকানো হয়। এই শুকনো চা পাতা প্যাকেট হয়ে চলে যায় যথাস্থানে।

চা পাতা তোলায় নিয়োজিত থাকে হাজার হাজার কুলি। এরা স্থানীয় মানুষ। বাগান মালিকের দেয়া জায়গায় এরা বসবাস করে। সকালে এরা দলবেঁধে আসে চা বাগানে, বিকেলে কাজ শেষ হলে ফিরে যায় নিজ জায়গায়। সিলেটের চা বাগানে অবশ্য বাংলাদেশের পর্যটন খাতে স্থান করে নিয়েছে অনেক আগে। তবে এখানেও প্রয়োজন we¯wZ চা বাগানে গিয়ে দেখা যাবে চা পাতা তোলা থেকে শুরু করে একেবারে প্যাকেট করা পর্যন্ত। পরিচিত হওয়া যাবে কুলিদের সঙ্গে। একেবারে কাছ থেকে চা বাগানের জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে একজন পর্যটক। এছাড়া চা বাগানের শান্ত প্রকৃতিও উপভোগ্য যে কারো জন্য। চা বাগানের জন্য যেমন প্রয়োজন পানি, তেমনি ছায়া। বাগানের মাঝে মাঝে প্রচুর ছায়াবৃক্ষ থাকায় অনেক পাখির আনাগোনা এখানে। এগুলোকে ঘিরে গড়ে তোলা যায় পর্যটন কেন্দ্র। এর জন্য নতুন করে কিছু করার দরকার হয় না। প্রয়োজন শুধু সংশ্লিষ্ট সুবিধা ও ব্যবস্থাপনার। তৈরি করতে হবে আধুনিক কটেজ এবং থাকতে হবে জিপের ব্যবস্থা। যেন পর্যটক জিপে করে সম্পূর্ণ বাগান ঘুরে দেখতে পারে। কারখানায় চা পাতা বিক্রির ব্যবস্থা থাকতে হবে। পর্যটক যেন একই সঙ্গে চা পাতা তৈরি দেখতে ও কিনতে পারে।

চা বাগান দেখতে আসা পর্যটক যাতে একই সঙ্গে উপভোগ করতে পারে অন্যান্য দর্শনীয় স্থান। মাধবকুন্ড জলপ্রপাত বা জাফলং। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করা প্রয়োজন। একইভাবে পঞ্চগড়ে চা বাগান দেখতে গিয়ে দিনাজপুরের দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে আসা যায়।

প্রতি বছর ভারতের দার্জিলিংয়ে প্রচুর মানুষ বেড়াতে যায়। রোপওয়েতে চড়ে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে চলে যায় বাগান দেখার জন্য। দার্জিলিং থেকে ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসে চা পাতার প্যাকেট। আমরা যদি আমাদের চা বাগানকে সমৃদ্ধ করতে পারি, পর্যটনের ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে এক সময় দেখা যাবে দার্জিলিংয়ের মতো এখানেও প্রচুর পর্যটক আসছে।

চিংড়ি ঘের

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট হলো 'সুন্দরবন'। সারা পৃথিবীর মানুষের কাছেই রয়েছে এর পরিচিতি। সুন্দরবনের সঙ্গে বাংলাদেশের যে জেলাটি পরিচিত সেটা হলো বাগেরহাট। কারণ সুন্দরবনের ৬২ শতাংশ পড়েছে এককভাবে বাগেরহাটের মধ্যে। সুন্দরবনের ভ্রমণ উপযোগী প্রায় সব কয়টি স্পটই পড়েছে বাগেরহাটের মধ্যে। তাই মংলায় (বাগেরহাটের একটি থানা) না এসে ভালোভাবে সুন্দরবন দেখা প্রায় অসম্ভব। শুধু মংলা নয়, বাগেরহাটের ৮টি থানাই এককভাবে হতে পারে

পর্যটকদের জন্য উপভোগ্য ভ্রমণের জায়গা। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, ধান, পান, সুপারিসহ নদীমাতৃক বাংলাদেশের সব সৌন্দর্য যেন একত্র হয়েছে এ জেলায়। খুলনা থেকে গাড়িতে বাগেরহাট যাওয়ার সময় পথের দু'ধারে সারি সারি গাছ চৈত্রের দুপুরেও প্রশান্তি এনে দেয়। চোখে পড়বে বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেত। মাছের ভেড়ি (চিংড়ি মাছের খামার)। এতে বাগেরহাটের প্রতিটি থানাতেই চিংড়ি মাছের চাষ হয়। যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে পর্যটন।

বাগেরহাট থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে 'বারুইপাড়া' ইউনিয়ন। চিংড়ি চাষের জন্য মিনি কুয়েত নামেই এটি বেশি পরিচিত। গাছে ঘেরা, পাখি ডাকা একটি ইউনিয়ন। গ্রাম বাংলার প্রায় সব ধরনের ফলই পাওয়া যায় এখানে। পাশেই বিশাল বিল। সেখানে রয়েছে শত শত চিংড়িঘের। গলদা ও বাগদা দু'ধরনের মাছের চাষ করা হয় এখানে। তবে গলদাই বেশি পাওয়া যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গলদার পোনা ছাড়া হয় এবং বিক্রির জন্য ধরা হয় কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে। আর প্রতি তিন মাস পর পর বাগদা বিক্রির জন্য ধরা হয়।

চার বিঘা থেকে ১৬ বিঘা জায়গা নিয়ে এখানকার ঘেরগুলো। প্রতিটি ঘেরের পাশে বাঁশ ও খড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বিশ্রাম ও পাহারা দেবার ঘর। প্রতিটি ঘেরে ধান চাষ করা হয়। বিশাল এলাকাজুড়ে এভাবে ধান ও মাছ একসঙ্গে চাষ করা হচ্ছে। এর ভেতর থেকে সাপের মতো আঁকাবাঁকা বয়ে চলেছে খাল। চোখে পড়বে বক, শালিক, কাঁদাখোচা, মাছরাঙাসহ নানা ধরনের পাখি। ভ্রমণ করা যায় নৌকায় চড়ে। চিংড়ি ঘেরগুলোর আশপাশে তৈরি করা যেতে পারে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট। ঘের মালিকদের বাড়িতেই পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রেস্টুরেন্টগুলোতে থাকবে চিংড়ি মাছের তৈরি নানা ধরনের খাবারের আয়োজন। পৃথিবীব্যাপী চিংড়ি একটি দামি খাবার। কিন্তু ট্যুরিস্টরা এখানে এসে স্বল্পমূল্যে টাটকা, তাজা চিংড়ির স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন।

বারুইপাড়া ইউনিয়ন থেকে দেড় কিলোমিটার ভেতরে রয়েছে সপ্তদশ শতকে নির্মিত ১৭৫ ফুট উঁচু একটি মঠ। বাগেরহাট সদর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরেই রয়েছে বিখ্যাত দরবেশ খানজাহান আলীর মাজার। মাজারের পাশে ৩৬০ বিঘা আয়তনের বিশাল দীঘি। দীঘিতে আছে পৃথিবীর বিরল প্রজাতির মিঠা পানির কুমির। সংরক্ষণের অভাবে বর্তমানে মাত্র দুটি কুমির জীবিত আছে। ভয়ঙ্কর এই প্রাণীকে ডাকলেই মানুষের কাছে চলে আসে। আদর করা যায় গায়ে হাত দিয়ে। খানজাহান আলীর মাজার থেকে এক কিলোমিটার দূরে ষাটগম্বুজ মসজিদ। এ ছাড়া বাগেরহাটে চলতে গেলে কিছুক্ষণ পরপরই চোখে পড়বে সপ্তদশ শতাব্দীর নানা ধরনের পুরাকীর্তি।

সবমিলিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের এই জেলাটিতে কর্তৃপক্ষ যথাযথ উদ্যোগ নিলে GLv‡b wPswo wfwËK chUb wkí M‡o †Zvjv hvq|

ফুলভিত্তিক পর্যটন

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে কৃষিপণ্য হিসেবে পাট, ধানই ছিল প্রধান। তাছাড়া বছরের বিভিন্ন সময় স্বল্প পরিসরে রবিশস্য উৎপন্ন হতো। কিন্তু বর্তমানে এ ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন এসেছে। উৎপন্ন হচ্ছে বিভিন্ন অপ্রচলিত শস্য। এগুলোর কোনো কোনোটি বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। যেমন : ভুট্টা, আজ থেকে ১০ বছর আগে ভুট্টার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আমদানির ওপর নির্ভর করতে হতো। কিন্তু এখন সেখানে এসেছে পরিবর্তন। দেশেই উৎপন্ন হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে এর চাহিদাও বাড়ছে।

এই অপ্রচলিত কৃষি কাজের ধারাবাহিকতায় দেশে এখন উৎপন্ন হচ্ছে নানা

জাতের ফুল। দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা থাকায় কৃষকরাও অন্যান্য ফসলের পরিবর্তে ফুলচাষে আগ্রহী হয়ে উঠছে। কোনো বৈরী আবহাওয়ার কবলে না পড়লে বছর শেষে আয় করছে মোটা অঙ্কের মুনাফা।

মূলত কুষ্টিয়া, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ জেলায় ফুল উৎপাদন হয় বেশি। এসব জেলাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে এ দেশে ফুলভিত্তিক পর্যটন।

এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ঝিনাইদহের মহেশপুর থানা এলাকাটিকে বেছে নেয়া যেতে পারে। এ থানাটির অধীনে যতগুলো গ্রাম আছে তার অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী, ফসলের মধ্যে ধানই প্রধান। তবে ইদানীং এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমিতে ফুল চাষ হচ্ছে। লাভ বেশি তাই ফুলচাষির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিদিন। দত্তনগর, সেজিয়া, ভৈরবা, তালঘর, পদ্মপুকুর প্রভৃতি গ্রামে প্রচুর পরিমাণে ফুল চাষ হচ্ছে। ফুলগুলোর মধ্যে গাঁদা, রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী প্রধান। ফাল্গুন মাসে এর চারা রোপণ করা হয় এবং ৫-৬ মাসের মধ্যে ফুল বিক্রি করা সম্ভব হয়। এই সময়টিতে দেখা যায় ক্ষেতভর্তি ফুলের সমারোহ।

মাঠভর্তি রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী ফুলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু এই ফুলের ক্ষেতগুলো রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। এভাবে না করে বিশাল প্লট আকারে করা হলে তা হবে খুবই আকর্ষণীয়, যেমনটি রয়েছে নেদারল্যান্ডসে। সেখানে মাঠের পর মাঠ জুড়ে থাকে বিভিন্ন জাতের ফুল। নেদারল্যান্ডসের ফুলের ক্ষেতগুলো অনুসরণ করে এসব গ্রামে ফুলের চাষ করা যেতে পারে। আর এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে এ দেশে ফুলভিত্তিক পর্যটন। ফুলের রয়েছে যেমন দেশী বাজার, ভালোমানের প্রক্রিয়াজাত করা হলে তা পৌঁছে যেতে পারে বিশ্ববাজারে। এই ফুল রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। অন্যদিকে এর নান্দনিক সৌন্দর্য দিয়ে আকর্ষণ করা যায় পর্যটকদের।

মহেশপুরে পোড়াপাড়া নামে একটি বাঁওড় রয়েছে। চারদিকে ধানক্ষেত, মাঝখানে এই বাঁওড় দেখতে খুবই চমৎকার। স্থানীয়দের মতো এই বাঁওড়ের পাশে ফুলের চাষ করা হলে তা ট্যুরিস্টদের নজর কাড়বে।

শুধু গাঁদা আর রজনীগন্ধাই নয়, দেশের ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, যশোর, মাগুরা এলাকার মাটি সূর্যমুখী চাষের উপযোগী। বর্তমানে এসব জেলার বেশকিছু জমিতে সূর্যমুখী ফুল চাষ করা হয়। মাঠের পর মাঠ যখন সূর্যমুখী ফুলে ভরে ওঠে তা খুবই আকর্ষণীয় দেখায়। এই সূর্যমুখী ফুলকে ভিত্তি করেও গড়ে উঠতে পারে পর্যটন। তবে ফুলভিত্তিক পর্যটন গড়ে উঠতে চাইলে সেখানে ফুলকে যাতে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় সে ধরনের প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। মাঠে ফুলগাছ লাগানো, ফুল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ- এসব ধাপ পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে হবে। একইভাবে সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেত্রে ফুলের বিচি থেকে সংগৃহীত তেলের কারখানা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। তাছাড়া সূর্যমুখী ফুলের তেল স্বাস্থ্যসম্মত ও অধিক পুষ্টিকর। ফলে চাষি ফুল চাষ করে ন্যায্যমূল্য পাবে এবং সে ফুল চাষ করতে আগ্রহী হবে।

সহযোগিতায় : **শেখ আশরাফ আলী ও ঊর্মি মল্লিক**
ছবি : **আনোয়ার মজুমদার, সালাহউদ্দিন টিটু, খালেদ সরকার**